অধ্যায় ৪

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা- সার্ক

South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC

অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়সমূহ

৪.১ ভূমিকা
৪.২ সার্ক গঠনের পটভূমি
৪.৪ সার্কের নীতিমালা
৪.৫ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা
৪.৬ সার্কের সফলতা ও ব্যর্থতা
৪.৭ সার্কের ব্যর্থতা
৪.৮ সার্ক-এর দুর্বলতা ও মূল্যায়ন
৪.৯ সার্কের ভবিষ্যৎ
৪.১০ সাপটা ও সাফটা সম্পর্কে আলোচনা
৪.৪ দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য ব্যবস্থা (SAPTA)
৪.১২ সাফটা (SAFTA)
৪.১৩ সাপটা ও সাফটার মধ্যে তফাৎ
৪.১৪ সাপটা চুক্তির বাস্তবায়ন এ অঞ্চলের স্বল্পোন্নত দেশের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো ১৯৮০'র দশকে সার্ক (SAARC) অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রতিষ্ঠা । ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) গঠিত হয়। সরকারি নাম হলো: আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশিয়া সমিতি বা সার্ক। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনে ৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ সার্কের সনদে স্বাক্ষর করেন। যে সমস্ত দেশকে নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছে তারা হলো ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপ। পরবর্তীতে অবশ্য আফগানিস্তানকে সার্কের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ায় বর্তমানে সার্কের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮-এ। এ ৮টি দেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিশেষ অঞ্চলে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এদের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার হিসেবে এরা সবাই কম-বেশি অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এবং আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ। নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই সার্ক গঠন করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক জোরদার ও উন্নয়নকে সন্নিহিত করার নিমিত্তে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্লাটফর্ম হিসেবে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

Scanned with CamScanner

SAARC

৪.২ সার্ক গঠনের পটভূমি (History of Organizing SAARC)

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি (বর্তমানে ৮টি) দেশের সমন্বয়ে গঠিত সহযোগিতা সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সন্দেহ ও সংশয় দূর করে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতেই সার্কের গঠনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৫০-৯০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হয় প্রায় ৬% হারে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় একই সময়ে বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ৪% হারে। এ প্রেক্ষাপটে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সার্ক গঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন ১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি লিখে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। চিঠিতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগিতা কাঠামো; যেমন- ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EEC), ল্যাটিন আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশন (লাফটা), আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC), এসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN)- এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা যাচাই করা এবং এ লক্ষ্যে একটি

মনে রাখার Technique & Tips

এক নজরে সার্ক

১৯৮০ → প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সার্কের প্রস্তাব।
↓
১৯৮১ → শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে সাত দেশের প্রতিনিধিগণের বৈঠক।
↓
১৯৮২ → ইসলামাবাদে বৈঠক।
↓
১৯৮৩ → ঢাকায় সাত দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক।
↓
২ আগস্ট, ১৯৮৩ → নয়াদিল্লীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের চুক্তি স্বাক্ষর এবং আনুষ্ঠানিক সার্কের জন্ম।
↓
(৭-৮) ডিসেম্বর, ১৯৮৫ → ঢাকায় সার্কের ১ম শীর্ষ সম্মেলন।
↓
৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ → সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।
↓
১৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭ → সার্ক সচিবালয় কাঠমুন্ডুতে স্থাপিত।
↓
২১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ → কলম্বোতে ৬ষ্ঠ শীর্ষসম্মেলনে সাপটা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত।
↓
১১ এপ্রিল, ১৯৯৩ → ঢাকায় ৭ম শীর্ষ সম্মেলনে সাপটা অনুমোদিত।
↓
৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ → সাপটা চুক্তি কার্যকর হয়
↓
৬ জানুয়ারি, ২০০৪ → ইসলামাবাদে দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলনে সাফটা চুক্তির স্বাক্ষর
↓
১ জুলাই, ২০০৬ → সাফটা কার্যকর হয়।
↓
১৫ মার্চ, ২০০৭ → সার্কের কার র‍্যালি কক্সবাজার হতে উদ্বোধন।
↓
২৩-২৫ মার্চ, ২০০৭ → সার্ক নাগরিক শীর্ষ সম্মেলন।
↓
২০০৭ → বনবেবী দেবী সার্ক লেখক।
↓
২৮ এপ্রিল, ২০১০ → সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SDF) যাত্রা শুরু করে।
↓
১০ নভেম্বর, ২০১১ → মালদ্বীপে সপ্তদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হয়।
↓
১ মার্চ, ২০১৪ → অর্জুন বাহাদুর থাপা (নেপাল) বর্তমান দ্বাদশ মহাসচিব হিসাবে নিয়োগ।

২০১৬ সালে → পাকিস্তানে নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

Scanned with CamScanner

শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এর সাথে তিনি কয়েকটি সহযোগিতার বিষয়ও তুলে ধরেন। যেমন– আবহবিদ্যা, টেলিযোগাযোগ, যাতায়াত, শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যা, কৃষি যৌথ উদ্যোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, জাহাজ চলাচল, নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার ইত্যাদি। তাঁর এ প্রস্তাব বিবেচনার উদ্দেশ্য ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে একটি সংস্থা গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে যৌথ বা একীভূত কর্মসূচী নামে একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে ৯টি সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই সার্কের জন্ম হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে চলতে থাকা উপনিবেশ-উত্তর রাজনীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতায়, অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও জাতিভেদ হিংসা দক্ষিণ এশিয়ায় যে সার্বিক পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী ছিল তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ও একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার জরুরি প্রয়োজন ছিল। এতদঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় ৭টি দেশের সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তৃক সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ সংস্থার জন্ম হয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন সার্ক এর সদস্যরা

৪.৩ সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Aims and Objectives of SAARC)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান,কারিগরি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান-প্রদান ও যোগাযোগ সহজ করাই ছিল সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক শাসনের দায় থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধু বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। কারণ সেই সমস্ত সাহায্যের পেছনে থাকে নানা ধরনের শর্ত। এ শর্তগুলো সাহায্যের কার্যকারিতাকে বহুলাংশে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই বহুদেশ সাহায্য গ্রহণে বিশেষভাবে আগ্রহী নয়। অথচ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রকে যদি বাড়িয়ে তোলা যায় তাহলে সেই সহযোগিতা

Scanned with CamScanner

অনেকটা বিদেশি সাহায্যের বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে সার্কের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।

সার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো হলো :

প্রথমত : দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা ও জীবনযাত্রারমান উন্নীতকরণ।

দ্বিতীয়ত : এ অঞ্চলের জনগণের জন্য এমন সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারে।

তৃতীয়ত : সার্কের লক্ষ্য হলো এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যৌথ আত্মবিশ্বাস (Collective self-reliance) গড়ে তুলতে সাহায্য করা। একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এ যৌথ আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়। আত্মবিশ্বাস গড়ে না উঠলে বিদেশি আগ্রাসন ও নয়া উপনিবেশবাদের অগ্রগমন রোধ করা যাবে না।

চতুর্থত : পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন ও সমস্যা উপলব্ধি করা সার্কের অন্য একটা উদ্দেশ্য।

পঞ্চমত : অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যকে উদ্দীপিত করা।

ষষ্ঠত : বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

সপ্তমত : যাবতীয় কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ করে না রেখে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর দেওয়া।

অষ্টমত : অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত অপরাপর আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সংগে সহযোগিতা করে চলা।

এছাড়া ঢাকা শীর্ষ বৈঠকে গৃহীত সার্ক সনদে সংস্থার নিম্নোক্ত লক্ষ্য ঘোষণা করা হয় :

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, প্রত্যেক মানুষকে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান।
৩. দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য দান।
৪. একে অপরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতায় সাহায্য দান।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা দান।
৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।
৭. আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার বিকাশ।
৮ এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা।

৪.৪ সার্কের নীতিমালা (Principles of SAARC)

সার্ক এর সনদের ২নং ধারায় সংকলিত নীতিসমূহে কয়েকটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয়; যথা-

প্রথমত : সার্কের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হবে সার্বভৌম সাম্য (Sovereign equality) নীতির ওপর। অর্থাৎ সার্ক স্বীকার করছে যে সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য টানা হবে না, প্রত্যেকেই সার্বভৌম এবং এ ব্যাপারে সমতাকে মেনে নিতে হবে। কেউ প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ পাবে না।

দ্বিতীয়ত : প্রতিটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

তৃতীয়ত : প্রতিটি রাষ্ট্র এমন আচরণ করবে যাতে অন্য রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বরং উপকৃত হয়। অর্থাৎ অন্যের ক্ষতিসাধন করা সার্কের নীতি হতে পারবে না।

চতুর্থত : সার্কের সমস্ত সদস্যের মধ্যে যেমন সহযোগিতা চলবে, তেমনি একই সঙ্গে চলবে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় সহযোগিতা। অর্থাৎ সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

সার্কের নীতি অনুসারে এই সংস্থাভুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো শিল্পায়নসহ দ্রুত আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে পশ্চিমা শক্তিগুলোর মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

Scanned with CamScanner

সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে :

১. সার্ক শীর্ষ সম্মেলন
২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন
৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪. প্রোগ্রামিং কমিটি
৫. টেকনিক্যাল কমিটি
৬. ওয়ার্কিং গ্রুপস ও
৭. সচিবালয়।

সার্ক সদস্যদেশগুলোর রাষ্ট্র/সরকারপ্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষ সম্মেলন সংস্থার সর্বোচ্চ ও একমাত্র নীতিনির্ধারণী সংস্থা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন নীতিমালা তৈরি, অগ্রগতির পর্যালোচনা, নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে স্ট্যান্ডিং কমিটি সদস্যদেশগুলোর পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত। এ কমিটির দায়িত্ব হলো বিভিন্ন কর্মসূচি সার্বিক মনিটরিং ও সমন্বয় সাধন করা, বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, তাদের অর্থ জোগানের মোরালিটি নির্ধারণ, বিভিন্ন কর্মসূচি প্রাধিকার নির্ধারণসহ নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ। টেকনিক্যাল কমিটি তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমানে ৭টি টেকনিক্যাল কমিটি রয়েছে। আর ওয়ার্কিং গ্রুপের দায়িত্ব হলো বিশেষ ইস্যু বিবেচনা করে সুপারিশমালা তৈরি ও সংশ্লিষ্ট সার্ক বডিতে পেশ করা।

সার্ক সচিবালয়ের কাজ হলো সার্কের বিভিন্ন কার্যক্রম মনিটরিং ও বাস্তবায়ন করা ও সংস্থার বিভিন্ন সভায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং সার্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। সার্ক সচিবালয় নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। এটি একজন সেক্রেটারি জেনারেল, ৭জন পরিচালক ও প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে গঠিত। সার্ক মহাসচিব ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী সদস্যদেশগুলো থেকে মনোনয়নের মাধ্যম তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র : সার্ক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হলো : ১. কৃষি; ২. স্বাস্থ্য ও জনসেবা; ৩. ডাক ও টেলিযোগাযোগ; ৪. মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার রোধ; ৫. আবহাওয়া; ৬. পল্লি উন্নয়ন; ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া; ৯. যাতায়াত ও পরিবহন; ১০. নারী উন্নয়ন; ১১. পর্যটন; ১২. পরিবেশ ও বন; ১৩. দারিদ্র্য বিমোচন; ১৪. সার্ক অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামের বিনিময়; ১৫. মহিলা ও শিশু।

এছাড়া সার্কের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। এগুলো হলো : ১. সার্ক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র; ২. সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র; ৩. সার্ক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র; ৪. সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র; ৫. সার্ক টিউবার কিউলোসিস কেন্দ্র। এছাড়া আরো তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো হলো :

১. সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্যান্ডি, শ্রীলংকা।
২. সার্ক উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, মালদ্বীপ।
৩. সার্ক তথ্যকেন্দ্র, নেপাল।

৪.৫ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা (Role of SAARC in Bring Peace and Prosperity)

দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। সার্ক তার লক্ষ্য অর্জনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি সত্যি কিন্তু তাই বলে এ সংস্থার অর্জনও একেবারে কম নয়। সদস্যদেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ভুল বোঝাবুঝি ও বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে তবেই সার্ককে সামনে এগোতে হয়েছে, যা অন্য কোনো আঞ্চলিক সংস্থাকে মোকাবিলা করতে হয় নি। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্ক যে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

Scanned with CamScanner

১. সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, যা এতদঞ্চলের অরাজনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

২. সার্ক তার People-to-people contact বৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে এতদঞ্চলের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে পর্যটক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসার ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরকে জানার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠেছিল, তা দূরীভূত হতে শুরু করেছে–যা এ অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

৩. সার্কের সুবাদে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম, আবহাওয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উন্নয়নে নারী, মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার রোধ প্রভৃতি। তাছাড়া সার্ক ফেলোশিপের আওতায় প্রতিবছর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্কের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থী বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পর লাভবান হচ্ছে।

সার্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন সার্কের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক। যদিও সার্ক চার্টারে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাকে সার্কের আলোচ্যসূচির বাইরে রাখা হয়েছে, তথাপি সার্ক সম্মেলন চলাকালীন সময়ে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে কোনো বাধা নেই। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ১২শ শীর্ষ সম্মেলনের সময় ইসলামাবাদ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় ধরে জমাট বাঁধা বরফ যেন হঠাৎই গলতে শুরু করে। উক্ত বৈঠককে ভিত্তি করে দুদেশের সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে দুদেশ প্রথমবারের মতো জম্মু ও কাশ্মির নিয়ে আলোচনা করতেও রাজি হয়। আর এর প্রভাব পড়েছে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ওপরও। ১২শ সার্ক সম্মেলনে সাফটা চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়াও সন্ত্রাসবিরোধী সার্ক কনভেনশন ও একটি 'সোশ্যাল চার্টার, স্বাক্ষরিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামাবাদ শীর্ষ সম্মেলনকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামাবাদ শীর্ষ সম্মেলনকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়। সার্কের ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে সফল শীর্ষ সম্মেলন।

এছাড়া ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তামিল সমস্যা এবং ইসলামাবাদে চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনের উপলক্ষ ছাড়া হয়তো দুদেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে বৈঠক সম্ভব হতো না। ফলে এসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যেত।

শীর্ষ সম্মেলন ছাড়াও প্রতিবছর সার্কের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, তথ্যমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, পর্যটনবিষয়ক মন্ত্রী, নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এসব সম্মেলন পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

অবৈধ মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার রোধের লক্ষ্যে সার্ক সদস্যদেশগুলো বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে। এসবের মাধ্যমে সদস্যদেশগুলোর জনগণের মধ্যে মাদকদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়াও এসবের সরবরাহ ও পাচার রোধে সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সার্ক ফুড সিকিউরিটি সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে সদস্যদেশগুলোর জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি 'খাদ্যনিরাপত্তা মজুদ' গড়ে তোলা হয়েছে। এর সুফল ইতোমধ্যেই সদস্যদেশগুলোর জনগণ পেতে শুরু করেছে। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে "South Asian Development Found (SADF)" গঠন করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশের বেশি লোকবাস করলেও দেশগুলোর মধ্যে আন্ত-বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই নগণ্য। তাই সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা (SAPTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। এর আওতায় সদস্যদেশগুলোকে বিভিন্ন পণ্যের ওপর ট্যারিফ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আন্ত-সার্ক বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়। SAPTA চুক্তির রেশ ধরে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ১২শ শীর্ষ সম্মেলনে South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়ে। সাফটা চুক্তিটি ২০১৬ সালে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এটি সার্কের এক বিরাট সাফল্য। এ চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু হলে সার্কের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্য হ্রাস পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সার্কের রয়েছে বেশ কয়েকটি ইস্যুভিত্তিক আঞ্চলিক কেন্দ্র। তন্মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র ও সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, নয়াদিল্লি সার্ক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, কাঠমান্ডুতে সার্ক টিউবার কিউলোসিস কেন্দ্র ও সার্ক তথ্যকেন্দ্র, ইসলামাবাদে সার্ক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, শ্রীলংকায় সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও মালদ্বীপে সার্ক উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের একটি গভর্নিং বোর্ড রয়েছে। এসব আঞ্চলিক কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ আদান-প্রদান গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যদেশগুলো উপকৃত হচ্ছে।

সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র ছাড়াও আওতায় বছরব্যাপী শতাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব কর্মসূচি সদস্যদেশগুলো ভাগাভাগি করে (অভিজ্ঞতা অনুযায়ী) আয়োজন করে থাকে। এসব কর্মসূচি সদস্যদেশগুলোর বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, শিক্ষা, গবেষক, ব্যবসায়ীদেরে মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ করে দেয়। এটিও সার্কের কম অর্জন নয়। সার্কের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এভাবে এতদঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি আনয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মূল্যায়ন (Evaluation)

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সার্কের অবদান উল্লেখযোগ্য না হলেও বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক কর্মসূচির সামগ্রিক প্রভাব সার্কভুক্ত দেশগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও অবস্থান সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এতদঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সার্কের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিসীম।

৪.৬ সার্কের সফলতা ও ব্যর্থতা (Success & Failure of SAARC)

সার্ক দক্ষিণ এশিয়ায় তার লক্ষ্য অর্জনে আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারে নি। এর সহযোগিতা কেবল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মূল ক্ষেত্রে (অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন) এখনও সার্ক তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে নি। অবশ্য SAPTA গঠন ও SAFTA গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সার্ক তার মূল ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। যদিও এর মাধ্যমে কার্যকর তেমন কিছু অগ্রগতি দেখা যায় না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সমঝোতা সৃষ্টিতে সার্কের চেনা তেমন প্রভাব ফেলে নি। অথচ আন্তর্জাতিক গবেষকদের মতে, যেকোনো আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য চারটি রাজনৈতিক পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। যথা :

১. বাইরের বা ভিতরের যেকোনো হুমকি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ

Scanned with CamScanner

এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জোটভুক্ত দেশসমূহকে অভিন্ন ও যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
২. জোটভুক্ত দেশসমূহের মাঝে অভিন্ন রাজনৈতিক ও যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
৩. জোটভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রনীতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ঘটনাপ্রবাহে কৌশলগত দিক নিয়ে অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;
৪. জোটভুক্ত দেশসমূহের মাঝে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশে চরম দারিদ্র্য, জাতিবিদ্বেষ, হিংসা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা প্রভৃতি সার্ককে অর্থহীন করে তুলেছে। বিশেষ করে বিতর্কিত ও দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহ সার্ক সনদের বাইরে রাখায় এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে পাক-ভারত সম্পর্ক, তামিল প্রশ্নে শ্রীলংকার সাথে ভারতের, বাংলাদেশের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন, পার্বত্য চট্টগ্রামও সীমান্তবিরোধ, নেপালের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক বিরোধ প্রভৃতি নিয়ে সার্কে আলোচনার সুযোগ না থাকায় এর সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সার্ক তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এজন্য অনেকের মতে, রাজনৈতিক বিষয়ে সমঝোতা ব্যতীত অর্থবহ আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রায় অসম্ভব। দিল্লির ৮ম শীর্ষ সম্মেলনে পাকিস্তান এ প্রসঙ্গে বেশ খোলাখুলিভাবেই বলেছে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে অন্য ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়।

দারিদ্র্য বিমোচনের কথা সার্কের প্রথম দিনই বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও এই অঞ্চলের প্রায় ৪৬% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাসকরে। ১৯৯৩ সালে ৭ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকা ঘোষণায় বলা হয়, ২০০২ সালের মধ্যে এ অঞ্চল থেকে দারিদ্র্য দূর করা হবে এবং ২০০০ সালের মধ্যেই প্রতিটি মানুষকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হবে। কিন্তু গত প্রায় এক যুগেও সাফ গেমস অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয় নি। কাশ্মির সমস্যাসহ এ অঞ্চলের দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য সার্ক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। ফলে এসব সমস্যা ও বিরোধ কমে নি; বরং তীব্রতর হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক দিয়ে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্যাপক কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে।

১৯৮৯ সালকে সার্ক দেশগুলো 'কন্যা শিশু বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে এবং বলা হয়, সাতটি দেশেরই কন্যা শিশুর চরম অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। শ্রমিক হিসেবে এদের অনেকের জীবন শুরু হয়। বিশেষ করে বহু কন্যা শিশু বর্তমানে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত। তাই সার্ক এ বিষয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অঙ্গীকার করে। কিন্তু এখনও সে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে নি। বরং ভারত ও শ্রীলংকায় হাজার হাজার কন্যা শিশু বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

সার্ক ইতিহাসে দীর্ঘ সময় পার হলেও আন্ত-সার্ক বাণিজ্য বৈষম্য আরো বেড়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের সাথে অন্য দেশের সব সময়ই প্রতিকূল ভারসাম্য বিরাজমান। ১৯৯৫ সালে আন্ত সার্ক বাণিজ্য সার্কভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে মোট রপ্তানি ছিল ৩.৭%। ২০০০ সালে এই হার আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৩.২%। সাপটা গঠনের পরও আন্ত-সার্ক বাণিজ্য তেমন সাফল্যজনক অগ্রগতি অর্জন করতে পারে নি। আর তাই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর চোখে এখনও দক্ষিণ এশিয়া 'অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল' হিসেবে বিবেচিত।

তবে গত ২৫ বছরে সার্ক কিছুই যে অর্জন করতে পারে নি তা নয়, বরং যে অগ্রগতি হয়েছে তা কোনো অংশেই উপেক্ষা করার মতো নয়। যেমন-

প্রথমত : সার্কের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেছে, যা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এর একটি আনুষ্ঠানিক সনদ রয়েছে এবং কাঠমান্ডুতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থাটির আর্থিক বিষয়ে 'টার্ম অব রেফারেন্স' এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: SAPTA চুক্তি সম্পাদন সার্কের একটি বড় ধরনের সাফল্য। ১৯৯৩ সালের ৭ম সার্ক সম্মেলনে SAPTA গঠন ও ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে সাটপার আওতায় সার্ক দেশসমূহ ট্যারিফ সুবিধা প্রদানসংক্রান্ত পণ্য তালিকা

Scanned with CamScanner

প্রস্তুত করেছে প্রায় ২০০০ পণ্যের ওপর ১০% শুল্ক হার হ্রাস করেছে। এর ফলে আন্ত-সার্ক বাণিজ্যে প্রতিকূল ভারসাম্য কমে আসবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

তৃতীয়ত : ইতোমধ্যে সার্ক তথ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন, সার্ক যোগাযোগমন্ত্রীদের সম্মেলন, সার্ক স্পিকার সম্মেলন, সার্ক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারিত হয়েছে। সার্কের প্রথমে যে সহযোগিতার ক্ষেত্র ছিল ১৩টি, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১টিতে। ফলে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের মাঝে আঞ্চলিক সহযোগিতার তাগিদে অনুভূত হচ্ছে।

চতুর্থত : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শীর্ষ সম্মেলনের সময় সার্কের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ সম্মেলনের বাইরে ঘরোয়া বৈঠকে দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময়ের সুযোগ পান। ইসলামাবাদে চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো সার্কের বাইরে একে অন্যের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর আক্রমণ না করা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ব্যাঙ্গালোর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে তামিল সমস্যা নিয়ে ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে আলোচনার ফলে সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের সাথে বাংলাদেশ, নেপাল এমনকি কাশ্মীর ইস্যু নিয়েও পাকিস্তানের আলোচনা হয়। এর ফলে পাক-ভারত উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং নানা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সমঝোতা সৃষ্টির সুযোগ ঘটে।

পঞ্চমত : কৃষি তথ্য সম্প্রসারণ ও কৃষির উন্নতির জন্য ইতোমধ্যে 'SAIC' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশসমূহের দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে সার্ক একটি তহবিল গঠন করেছে। এর নাম হলো 'South Asian Development Fund' সংক্ষেপে SADF।

ষষ্ঠত : দক্ষিণ এশীয় খাদ্য নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তি এ অঞ্চলের দেশগুলোর খাদ্যচাহিদা পূরণ ও খাদ্য আমদানিতে সুফল দিচ্ছে। বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজন মেটাতে সার্কের দেশগুলো নিজেদের মজুদ থেকে একে অপরকে সহযোগিতা করছে।

অন্যদিকে SAPTA গঠনের পর অবাধ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সার্ক ২০০৩ সালের মধ্যে SAFTA (South Asian Free Trade Area) স্বাক্ষরেরও সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হয়। নারীদের অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, পরিবেশ ও এনজিওবিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সার্ক সফলতার দাবিদার।

সপ্তমত : দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সন্ত্রাসবাদ আজ নানাভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। কোথাও মৌলবাদের মোড়কে, কোথাও জাতি বিদ্বেষ, আবার কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদের অন্তরালে। সার্কের ৭টি দেশই এই সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার। তাই সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ৮ম শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে সন্ত্রাস পুরোপুরি বন্ধ না হলেও এর ব্যাপকতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

৪.৭ সার্কের ব্যর্থতা (Failure of SAARC)

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হলেও বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও নানাবিধ অন্তরায়ের ফলে সার্ক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এসব দুর্বলতা ও অন্তরায়গুলো হলো :

১. সার্কের সনদে কোনো দ্বি-পক্ষীয় বিষয় আলোচনার সুযোগ নেই। আবার রাজনৈতিক বিষয়েও

Scanned with CamScanner

কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রাখা হয় নি। সার্কের এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার দ্বি-পক্ষীয় সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে কোনো শান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অথচ এ দুটি বিষয় আঞ্চলিক শান্তি ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

২. আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতিতে অভিন্নতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু সহযোগিতার এই উপাদানটি এ অঞ্চলে অনুপস্থিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পুঁজিবাদী ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের দৃঢ় সম্পর্কের কারণে ভারতের সঙ্গে কৌশলগত বিরোধে লক্ষণীয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভারতমুখী নীতি ভারত ও পাকিস্তানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির এই ভিন্নতা দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার পথে অন্তরায়।

৩. আঞ্চলিক সহযোগিতার আরেকটি উপাদান হলো সদস্যদেশগুলোর নিরাপত্তা সম্পর্কে ঐকমত্য। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই নিজেদের হুমকি মনে করে। যেমন, পাকিস্তান তার নিরাপত্তার জন্য ভারতকে, ভারত পাকিস্তানকে এবং বাংলাদেশ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ভারতকে হুমকি বলে মনে করে। নিরাপত্তা সম্পর্কে ঐকমত্য না থাকায় সার্কের বন্ধন সুদৃঢ় হয় নি।

৪. দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আজ আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সে এ অঞ্চলের সমগ্র এলাকার ৭২ ভাগ, জিএনপির ৭৯ ভাগ, বাণিজ্যের ৫৯ ভাগ, জনসংখ্যার ৭০ ভাগ এবং বিশ্বের চতুর্থ সামরিক বাহিনীর অধিকারী। ওপরোন্ত ভারত আজ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। অবশ্য পাকিস্তানও এই শক্তি অর্জন করেছে। সম্পদ ও সামরিক দিক দিয়ে ভারতের বড় ভাইসুলভ আচরণ অন্য দেশসমূহের মাঝে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত করেছে। ফলে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সার্ক নয়, ভারতই মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে সার্ক একেবারেই নিষ্ক্রিয়।

৫. সাম্প্রতিক এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক ও চরমপন্থী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এসব শক্তি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় তৎপর রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- সাম্প্রতিক অযোধ্যায় হিন্দু-মুসলিক দাঙ্গায় প্রায় ১ হাজার প্রাণহানি, পাকিস্তানে ইসলামি জঙ্গি গ্রুপ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে হামলা, শ্রীলংকায় এলটিটিই গেরিলাদের তৎপরতা, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক প্রভৃতি ঘটনা এই অঞ্চলের শান্তি ও সহযোগিতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ঘটনার কারণে অনেকবার সার্ক সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায় এবং নেপালে একাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। তাই এসব প্রতিকূলে উপাদানসমূহ দূর করা না হলে সার্ক কখনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না।

৪.৮ সার্ক-এর দুর্বলতা ও মূল্যায়ন (Weaknesses of SAARC and its evaluation)

সার্ক-এর প্রথম দুর্বলতা ও ব্যর্থতা হলো সার্ক দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অনিয়ন্ত্রিত সন্দেহের বাতাবরণ।

- **প্রথমত,** ভারতের একক নেতৃত্বদান প্রসঙ্গে সার্ক-এর ছোটো দেশগুলোর সন্দেহ এবং সেই সন্দেহ থেকে পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রের চীনের শরণাপন্ন হওয়া ও চীনের সঙ্গে আঁতাত পারস্পরিক বিশ্বাসভঙ্গের নজির হয়ে ওঠেছে।
- **দ্বিতীয়ত,** সার্ক-এর সাফল্যের পথে মূল বাধা হলো ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার জটিল সম্পর্ক, স্পষ্টভাবে বৈরিতার সম্পর্ক।
- **তৃতীয়ত,** পাকিস্তানের মতো দেশ মাঝে মাঝেই কাশ্মীর সমস্যার মতো, দ্বি-পাক্ষিক ইস্যুকে সার্ক-এর মঞ্চে তুলে দক্ষিণ এশীয় আন্তঃরাষ্ট্র সংগঠনটিকেই দুর্বল করেছে।
- **চতুর্থত,** সার্ক-এর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর নানাবিধ অভ্যন্তরীণ সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, জাতি-ভাষা-ধর্মকে কেন্দ্র করে চলা অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষজনিত জাতীয় সংহতির বিপন্নতা এবং সর্বোপরি, অনুন্নত

Scanned with CamScanner

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যত, সার্ক-কে দুর্বলতর করে তুলেছে।

কিন্তু এসব ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই SAARC আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে। পর্যবেক্ষকদের মতে, 'The removal of these bottlenecks is a long-term and pains-taking affair. SAARC is a very young and tender plant. It is to be carefully nursed and protected. Any ill-conceived step may cry a halt to the progress already achieved.' বলার অপেক্ষা রাখে না যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানসহ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতিই প্রধানত সার্ক-এর চলার পথ অনেক বেশি মসৃণ করতে পারে। কারণ এ দুটি প্রতিবেশী দেশই এ সংগঠনের দুটি মূল স্তম্ভ।

৪.৯ সার্কের ভবিষ্যৎ (Future of SAARC)

সার্কের অস্তিত্ব প্রশ্নে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। বিশেষ করে অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা, সার্ক দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ বজায় থাকলে সার্কের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এজন্য সার্কের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় দেশ হিসেবে ভারতকে তার আচারণ ও কার্যক্রমে সংযত হতে হবে এবং ভারতের সাথে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের বিদ্যমান দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। নতুবা পারস্পরিক সংঘাত আরো বেড়ে যাবে। ইতোমধ্যে কাশ্মীর ইস্যু ও পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারত ১৯৯৯ ও ২০০২ সালে যুদ্ধের প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় সার্কের ভবিষ্যৎ খুব বেশি উজ্জ্বল নয় বরং বর্তমানে এটা শুধু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর সৌহার্দ্য বিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পারস্পরিক সফরের মধ্যে সার্ক অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় সার্ককে কার্যকর করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকটের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, শিল্পায়ন বাড়তে হবে এবং বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আর এজন্য SAPTA ও SAFTA কে কার্যকর ভূমিকায় রূপ দিতে হবে।

২. আন্তআঞ্চলিক বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা আবশ্যক।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য সম্পদ সঠিকভাবে আহরণ করা হয় সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

৪. নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার আর কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবেনা। তাই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়ার মূল ধারার সঙ্গে এ অঞ্চলে সমন্বয় ঘটিয়ে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা দরকার ।

৫. এ অঞ্চলে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ব্যাপারে বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে সার্কের সাফল্য সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

৬. এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি যুগোপযোগী করতে হবে। সার্কের সদস্য দেশগুলোর বিনিয়োগ নীতিমালার ভবিষ্যৎ নির্দেশনা ও সঙ্গতি নিশ্চিত করার জন্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৭. একই সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে কর ও শুল্ক কাঠামোর। তুলে দিতে হবে অশুল্ক বাধাসমূহ।

৮. এ অঞ্চলে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে এবং জরুরিভাবে অনুভূত হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রযুক্তিগত কৌশলের অবাধ-প্রবাহের।

মূল্যায়ন (Evaluation)

সার্কের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়বে এবং আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য চাঙা হবে; যা উচ্চ

Scanned with CamScanner

প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতামূলক বিশ্বপরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেসরকারি খাতের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া সরকারগুলো নিজেরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। সার্ককে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এমনকি গৌণ বিবেচনা করা সম্ভব নয়। বরং পারস্পরিক সহযোগিতাও পরস্পরের পরিপূরক-ভাই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে নিজেদের অর্থনীতির ক্ষতি হতে পারে এমন বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এ অঞ্চলের সম্পদ এবং তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে সার্ক চেম্বার এবং সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে একসঙ্গে বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করতে পারে। সার্ক অঞ্চলের অসম কর, শুল্ক, ট্যারিফ, পারা ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ আন্ত-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে উদার বাণিজ্য-সুবিধাদি এবং আকর্ষণীয় বিনিয়োগ নীতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল হতে একে ঘিরে নানা সংশয় গড়ে ওঠে। পারস্পরিক সহযোগিতার সার্বিক বিকাশই যদি সার্কের সফলতার চাবিকাঠি হয় তবে মানদণ্ডে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের অনাগ্রহ ও কর্তৃত্বভাব সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ফলে সার্কের সফলতার চাইতে ব্যর্থতার পাল্লা বেশি ভারি।

Scanned with CamScanner